# কুরবানীর বিধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরবানির বিধিবিধানের বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

কুরবানীর ফযীলত

‘উযহিয়্যাহ’ কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি ‘যুহা’ শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে ‘উযহিয়্যাহ’ বলা হয়েছে। যাকে ‘যাহিয়্যাহ’ বা ‘আযহাহ’ও বলা হয়। আর ‘আযহাহ’ এর বহুবচন ‘আযহা’। যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে ‘ঈদুল আযহা’। বলা বাহুল্য, ঈদুযযোহা কথাটি ঠিক নয়।

কুরবানী শব্দটিও ‘কুর্ব’ ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ নৈকট্য। কুরবান হল, প্রত্যেক সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর সেখান থেকেই ফারসী বা উর্দু-বাংলাতে গৃহীত হয়েছে ‘কুরবানী’ শব্দটি।

কুরবানী করা কিতাব, সুন্নাহ ও সর্বাদিসম্মতিক্রমে বিধেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

‘অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর।[1]

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে নামায ও কুরবানী এই দু’টি ইবাদাতকে একত্রিত করে পালন করতে আদেশ করেছেন। যে দু’টি বৃহত্তম আনুগত্যের অন্যতম এবং মহত্তম সামীপ্যদানকারী ইবাদত। আল্লাহর রসূল (সা.) সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমার (রা.) বলেন, ‘‘নবী (সা.) দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।’’[2]

আনাস (রা.) বলেন, ‘রসূল (সা.) দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু’শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু’টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।’[3]

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না।[4] যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করতে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।’’[5]

তিনি আরো বলেন, ‘‘সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।’’[6]

সকল মুসলিমগণ কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।[7]

তবে কুরবানী করা ওয়াজিব না সুন্নাত -এ নিয়ে মতান্তর আছে। আর দুই মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। যার জন্য কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ উলামা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নাত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা এই যে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। '[৪]' উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী (সা.)-এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

বস্তুতঃ কুরবানীতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের খাতে অর্থব্যয় (ও স্বার্থত্যাগ) হয়। যাতে তাওহীদবাদীদের ইমাম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। ইসলামের একটি প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরিবার ও দরিদ্রজনের উপর খরচ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করা হয়। এত কিছুর মাধ্যমে মুসলিম ঈদের খুশীর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেই মুসলিম আনন্দলাভ করতে পারে। সেই খুশীই তার আসল খুশী। রমযানের সারা দিন রোযা শেষে ইফতারের সময় তার খুশী হয়। পূর্ণ এক মাস রোযা করে সেই বিরাট আনুগত্যের মাধ্যমে ঈদের দিনে তারই আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই খুশীই তার যথার্থ খুশী। বাকী অন্যান্য পার্থিব সুখ-বিলাসের খুশী খুশী নয়। বরং তা সর্বনাশের কদমবুসী। আল্লাহ তা'আলা কিছু জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, ''এ এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ প্রকাশ করতে।''[৭]

কারুনের পার্থিব উৎফুল্লতা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন,